সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক ; আল্লাহ্ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তার হুকুম-আহকামের সাথে এবং তার রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? (৬৬) ছলনা করো না ; তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহ্গার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সেসব মুনাফিকের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নবী করীম (সা)-কে কষ্ট দান করে। (অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে এমন সব কথা বলে যা শুনে তিনি কষ্ট পান।) আর (এ ব্যাপারে যখন কেউ বাধা দেয় কিংবা বারণ করে, তখন) বলে, তিনি সব কথাই কান লাগিয়ে শুনে নেন। (তাঁকে মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দেয়া সহজ ব্যাপার। কাজেই কোন ভাবনা নেই। উত্তরে) আপনি বলে দিন, [তোমরা নিজেরাই প্রতারিত হয়েছ —রসূলের কোন কথা শুনে নেয়া দু'রকম হয়ে থাকে। (১) সত্য হিসাবে—যাকে মনে মনেও যথার্থ বলে জানেন এবং (২) সদাচার ও মহত স্বভাবের তাগিদ হিসাবে অর্থাৎ এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, কথাটি একান্তই ভুল স্বীয় মহত স্বভাবের দরুন তা প্রত্যাখ্যান করেন না কিংবা বক্তার প্রতি কটাক্ষও করেন না এবং সরাসরি মিথ্যাও বলেন না। বস্তুত] সে নবী কান দিয়ে (মনোযোগের সাথে) তো সেসব কথাই শুনেন যা তোমাদের পক্ষে (কল্যাণই) কল্যাণকর। (সারমর্ম হচ্ছে এই যে,) তিনি আল্লাহ্র (কথা ওহীর মাধ্যমে জেনে নিয়ে তাঁর) উপর ঈমান আনেন (যার সত্যতা স্বীকার করার কল্যাণ, সমগ্র বিশ্বের জন্যই সুবিদিত। কারণ, শিক্ষা ও ন্যায়বিচার সত্যতার স্বীকৃতির উপরই নির্ভরশীল।) আর (তিনি নিষ্ঠাবান) মু'মিনদের (ঈমান ও নিষ্ঠাভিত্তিক) কথায় বিশ্বাস করেন। (বস্তুত এ বিষয়টির কল্যাণকারিতাও স্পষ্ট। কারণ, সাধারণ ন্যায়বিচার ঘটনার যথাযথ সংবাদ ও অবগতির উপরই নির্ভরশীল। আর এর মাধ্যম হচ্ছেন এই নিষ্ঠাবান মু'মিনবৃন্দ। যা হোক, কান দিয়ে মনোযোগ সহকারে এবং সত্য বিবেচনায় তো শুধু সত্য ও নিষ্ঠাবানদের কথাই শুনেন) তবে (তোমাদের কটু কথাও যে তিনি শুনেন), তার কারণ হলো এই যে, তিনি সেসব লোকের অবস্থার উপর করুণা করেন, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান প্রকাশ করে (যদিও তাদের অন্তরে ঈমান থাকে না। সুতরাং এই করুণা ও সদাচারের কারণেই তোমাদের কথাও শুনে নেন। আর এই বাস্তব সত্যটি জানা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করেন। কাজেই এই শোনা অন্যরকম। তোমরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার দরুন এ শ্রবণকেও প্রথম প্রকারের শ্রবণ বলেই মনে কর। সার কথা এই যে, তোমরা মনে কর যে, প্রকৃত সত্যটি হুযুর বোঝেন না অথচ আসলে সত্য বিষয়টি তোমরাই বুঝতে পার না।) আর যারা রসূল (সা)-কে কষ্ট দেয় তো

সেসব কথার দ্বারাই হোক যা বলার পর اُذُنٌ বলেছিল কিংবা هو اذن বলেই হোক—(হুযূরকে اذن বা কালা বলে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য ছিল যে, মাআযাল্লাহ্—তাঁর কোন বুঝ নেই, যা কিছু শুনেন, তাই মেনে নেন)। তাদের বেদনা-দায়ক শাস্তি হবে। এসব লোক তোমাদের (মুসলমানদের) সামনে (মিথ্যা) কসম খায় (যে, আমরা অমুক কথা বলিনি কিংবা আমরা অমুক অসুবিধার কারণে যুদ্ধে যেতে পারিনি—) যাতে তোমাদের রাযী করাতে পারে (যাতে তাদের জানমাল নিরাপদ থাকে)। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এ ব্যাপারে বেশি অধিকার রাখেন যে, এরা যদি সত্যিকার মুসলমান হয়, তবে তাঁকে রাযী করবে (যা নিষ্ঠা ও ঈমানের উপর নির্ভরশীল) তাদের কি এ বিষয় জানা নেই যে, যে লোক আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে, (যেমন এরা করছে) একথা স্থিরীকৃত হয়ে আছে যে, এমন সব লোকের ভাগ্যে দোযখের আগুন এমনভাবে ঘটবে যে, তাতে তারা চিরকালই বাস করবে। (বস্তুত) এটি হল বড়ই অপমানজনক (বিষয়)। যারা মুনাফিক তারা (স্বভাবতই) এ ব্যাপারে আশঙ্কা করে যে, মুসলমানদের উপর (ওহীর মাধ্যমে) এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে যায় যা তাদেরকে মুনাফিকদের অন্তরের গোপন তথ্য অবহিত করে দেবে। (অর্থাৎ তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপাত্মক কথা গোপনে বলেছে মুসলমানদের হিসাবে সেগুলো মনের গোপন রহস্যেরই অনুরূপ—এবং তাদের ভয়, সেগুলো না মুসলমানদের নিকট ফাঁস হয়ে যায়!) আপনি বলে দিন, যাই হোক, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক। (এতে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সম্পর্কে অবগতির বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব পরে বলা হচ্ছে—) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সে বিষয়টি প্রকাশ করবেনই, যার (ফাঁস হয়ে যাবার) ব্যাপারে তোমরা আশঙ্কা করছিলে। বস্তুত আমি প্রকাশ করে দিয়েছি যে, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে। আর (তা ফাঁস হয়ে যাবার পর) আপনি যদি তাদের কাছে (এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের) কারণ জিজ্ঞেস করেন, তবে বলে দেবে, আমরা তো এমনিতেই হাসি-কৌতুক করছিলাম। (এর বাস্তব অর্থ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু সফরটা যাতে সহজ হয়, সে জন্য কেবলমাত্র মনে আনন্দলাভের জন্য এসব কথা মুখে মুখে বলছিলাম।) আপনি (তাদের) বলে দিন যে, তোমরা কি তাহলে আল্লাহ্র সাথে, তাঁর আয়াতসমূহের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে হাসি-তামাশা করছিলে? (অর্থাৎ উদ্দেশ্য যাই থাকুক, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, তোমরা ঠাট্টা কার প্রতি করছ! এ ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ কোন উদ্দেশ্যেই জায়েয নয়। কাজেই) এখন আর তোমরা (নিরর্থক) ওযর করো না। (অর্থাৎ কোন ওযর-আপত্তিই কবুল হবে না। আর এত-দ্বয়ের দরুন ঠাট্টা করা বৈধ হয়ে যাবে না।) তোমরা তো নিজেদের মু'মিন বলে পরিচয় দিয়ে কুফরী করতে শুরু করেছ। (কারণ, দীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা একান্তই কুফরী, যদিও তাদের অন্তরে পূর্ব থেকেই ঈমান বিদ্যমান ছিল না। অবশ্য কেউ যদি অন্তরের সাথে তওবা করে নেয় এবং প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায়, তবে অবশ্য কুফরী ও কুফরীর আযাব হতে অব্যাহতি লাভ করবে। কিন্তু সে তওফীকও সবার হবে না।

অবশ্য কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাবে এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে,) তোমাদের মধ্যে কারো কারোকে যদি ছেড়েও দেই (যেহেতু তারা মুসলমান হয়ে গেছে) তবু আমি কারো কারোকে (অবশ্যই) শাস্তি দান করব এ কারণে যে, তারা (খোদায়ী জ্ঞান অনুযায়ী) ছিল পাপী (অর্থাৎ তারা মুসলমান হয়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহেও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মত মুনাফিকদের নিরর্থক আপত্তি প্রদর্শন ও রসূলে করীম (সা)-কে কষ্ট দান এবং অতপর মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের ঈমান সম্পর্কে অন্যের বিশ্বাস সৃষ্টির ঘটনা এবং সে ব্যাপারে সতর্কতা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ঠাট্টাস্বরূপ বলে থাকে যে, তিনি তো কান বিশেষ মাত্র। অর্থাৎ কারো কাছে কোন কিছু শুনতে পারলেই তাতে বিশ্বাস করে বসেন। কাজেই আমাদের কোন চিন্তার কারণ নেই। আমাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়লেও পরে আমরা কসম খেয়ে নিজেদের নির্দোষিতা সম্পর্কে বিশ্বাস করিয়ে দেব। তারই উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নির্বুদ্ধিতা বিধৃত করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি যে মুনাফিক ও বিরোধী লোকদের ভ্রান্ত কথা শুনেও নিজের সৎস্বভাবের কারণে চুপ করে থাকেন, তাতে একথা বুঝো না যে, শুধু তোমাদের কথাতেই বিশ্বাস করে থাকেন। বরং তিনি সব বিষয়েরই যথার্থ তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত। তোমাদের ভ্রান্ত কথা শুনে তিনি তোমাদের সত্যবাদিতায় স্বীকৃত হয়ে যান না। অবশ্য নিজের শালীনতা ও সৎস্বভাবের কারণে তোমাদের কথা মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করেন না।

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ আয়াতে এ খবর দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ করে থাকেন তারই একটি হল গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা, যখন কিছু মুনাফিক মহানবী (সা)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অবহিত করে সে পথ থেকে সরিয়ে দেন যেখানে মুনাফিকরা এ কাজের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্তর জন মুনাফিকের নাম, তাদের পিতৃপরিচয় ও পূর্ণ ঠিকানা-চিহ্নসহ বাতলে দিয়েছিলেন, কিন্তু রাহ্মাতুললিল্ আলামীন তা লোকদের সামনে প্রকাশ করেননি। —(মাযহারী)

الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۭ نَسُوا اللّٰهَ
فَنَسِيَهُمْ ۭ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ
وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ
وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا
بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَاْتِهِمْ
نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۠ وَقَوْمِ
اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ
فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

(৬৭) মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শিখায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান। (৬৮) ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জন্যে দোযখের আগুনের—তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। (৬৯) যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল শক্তিতে এবং ধন-সম্পদের ও সন্তান-সন্ততির অধিকারীও ছিল বেশি; অতপর উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা। আবার তোমরা ফায়দা উঠিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা—যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ফায়দা উঠিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও চলছ তাদেরই চলন অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে দুনিয়া

ও আখিরাতে। আর তারাই হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন। (৭০) তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের, আ'দের ও সামূদের সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেওয়া হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে। বস্তুত আল্লাহ্ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা সবাই একই রকম। তারা খারাপ কথার (অর্থাৎ কুফরী ও ইসলাম বিরোধিতার) শিক্ষা দেয়, ভাল কথা (অর্থাৎ ঈমান ও নবীর আনুগত্য) থেকে বারণ করে এবং (আল্লাহ্র রাহে খরচ করতে) নিজের হাতকে বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহ্র প্রতি লক্ষ্য করেনি (অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করেনি) সুতরাং আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহমত করেননি। নিঃসন্দেহে এসব মুনাফিক অত্যন্ত উদ্ধত। আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদেরকে এবং যারা (প্রকাশ্য) কুফরী করে তাদের জন্য দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটি তাদের জন্য (শাস্তি হিসাবে) যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দেবেন এবং (ওয়াদা অনুযায়ী) তাদের উপর আযাব হবে চিরস্থায়ী। (হে মুনাফিককুল! কুফরী ও কুফরীর সাজাপ্রাপ্তির দিক দিয়ে) তোমাদের অবস্থা তাদেরই মত যারা তোমাদের পূর্ববর্তীকালে বিগত হয়ে গেছে, যারা ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল। তারা নিজেদের (পার্থিব) অংশের দ্বারা প্রচুর ফায়দা লুটেছে। তোমরাও তোমাদের (পার্থিব) অংশের দ্বারা ফায়দা লুটেছ; যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিজেদের (পার্থিব সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যের) অংশের দ্বারা ফায়দা লুটেছিল। আর তোমরা খারাপ বিষয়ের ভেতরে তেমনি মজে গেছ; যেমন করে তারা (খারাপ) বিষয়ে মজে ছিল। তাদের (সৎ) কর্মসমূহ দুনিয়া ও আখিরাত (সর্ব) ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয়ে গেছে (—দুনিয়াতে তাদের সেসব কাজের জন্য সওয়াবের কোন সুসংবাদ যেমন নেই তেমনি আখিরাতে কোন সওয়াব নেই।) আর (দুনিয়া ও আখিরাতে এহেন বিনষ্টের দরুন) তারা বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে আছে। (উভয় জগতেই সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তেমনি তোমরাও যখন তাদের মতই কুফরী কর, তখন তোমরাও তাদের মতই বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসেনি। তোমাদের এসব বস্তুসামগ্রীও কোন কাজে আসবে না।—এই তো গেল পরকালীন ক্ষতির কথা; অতপর পার্থিব ক্ষতির কথা আলোচনা করে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে,) এদের কাছে কি সেসব লোকের (আযাব ও ধ্বংসের) সংবাদ পৌঁছায়নি যারা এদের পূর্বকালে বিগত হয়েছে? যেমন, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়, আদ ও সামূদ জাতি এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও মাদইয়ানের অধিবাসীবৃন্দ এবং উল্টে দেয়া জনপদ—(অর্থাৎ লূতের জাতির জনপদ)। সুতরাং (এই

ধ্বংসের ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর জুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করত। (কাজেই এসব মুনাফিককেও ভয় করা উচিত।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে মুনাফিকদের একটি অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের হাতকে বন্ধ করে রাখে ঃ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ— তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, হাত বন্ধ রাখার অর্থ জিহাদ বর্জন ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ--এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তারা যখন আল্লাহ্কে ভুলে গেছে, তখন আল্লাহ্ও তাদেরকে ভুলে গেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ ভুল বা বিস্মৃতির দোষ থেকে পাক। কাজেই এখানে এর মর্ম এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কামকে এমনভাবে বর্জন করেছে যেন একেবারে ভুলেই গেছে, তাই আল্লাহ্ তা'আলাও আখিরাতের সওয়াবের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন যে, নেকী ও সওয়াবের তালিকায় তাদের নাম থাকেনি।

৬৯তম আয়াত ঃ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ— এতে এক তফসীর অনুযায়ী মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তী ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় তফসীর মতে এতে মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। (অর্থাৎ اَنْتُمْ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ) মর্ম এই যে, তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরই মত। তারা যেমন পার্থিব ভোগ-বিলাসে মজে গিয়ে আখিরাতকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়েছিল এবং নানাবিধ পাপ ও অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমনিভাবে তোমরাও তাই করবে।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) বলেছেন তোমরাও সে পন্থা অবলম্বন করবে যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা করেছে—হাতের মধ্যে হাত, বিঘতের মধ্যে বিঘত। অর্থাৎ হুবহু তাদের নকল করবে। এমনকি তাদের মধ্যে যদি কেউ গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তবে তোমরাও ঢুকবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, এই হাদীসের সত্যায়নকল্পে যদি তোমাদের মন চায়, তবে কোরআনের كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতটি পাঠ করে নাও।

একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, مَا اَشْبَهَ اللَّيْلَةُ بِالْبَارِحَةِ অর্থাৎ আজকের রাতটির গত রাতের সাথে কতই না মিল রয়েছে এবং উহার সহিত কতই না সামঞ্জস্যশীল। ওরা ছিল বনী ইসরাঈল, আমাদেরকে তাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। —(কুরতুবী)

হাদীসের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, শেষ যমানার মুসলমানরাও ইহুদী-নাসারাদেরই মত পথ চলতে আরম্ভ করবে। আর মুনাফিকদের আযাবের বর্ণনার পরে এ বিষয়টির আলোচনায় এ ইঙ্গিতও বোঝা যায় যে, ইহুদী-নাসারাদের মত ও পথের অনুসারী মুসলমান তারাই হবে যাদের অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান নেই। নেফাকের জীবাণু তাদের মধ্যে বিদ্যমান। উম্মতের সৎলোকদের তা থেকে বাঁচার জন্য এ আয়াতে হিদায়ত দেওয়া হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ
يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ
طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ ذٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ
وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(৭১) আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৭২) আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড়

হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা। (৭৩) হে নবী, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফিকদের সাথে ; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীরা হল পরস্পরের দীনী সহচর। তারা সৎ ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ ও অকল্যাণ থেকে বারণ করে। নিয়মিত নামায পড়ে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করে। অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহ্‌মত করবেন। (-- وعد الله -- এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শীঘ্রই এ বিষয়ের বিশ্লেষণ আসছে।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা (একক) ক্ষমতাশীল। (তিনি পরিপূর্ণ প্রতিদান দিতে সক্ষম।) সু-কৌশলী (তিনি যথাযথ প্রতি-দান দিয়ে থাকেন। অতপর সে রহমতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের সাথে এমন (জান্নাত বা) কানন-কুঞ্জের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণসমূহ বইতে থাকবে। তাতে তারা চিরকাল বাস করতে থাকবে এবং মনোরম পরিচ্ছন্ন বাসগৃহের (প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন) যা সেসব চিরস্থায়ী কানন-কুঞ্জসমূহে অবস্থিত থাকবে। আর (এ সমুদয় নিয়ামতের সাথে সাথে জান্নাতবাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সার্বক্ষণিক যে) সন্তুষ্টি বিরাজ করবে তা হবে সেসব নিয়ামত অপেক্ষা বড় বিষয়। এই (উক্ত প্রতিদানই) হল সবচেয়ে মহান কৃতকার্যতা। হে নবী (সা) কাফিরদের সাথে (সশস্ত্রভাবে) এবং মুনাফিকদের সাথে (মৌখিকভাবে) জিহাদ করুন। এবং তাদের উপর কঠোর হোন (দুনিয়াতে) এরা তারই যোগ্য। আর (আখিরাতে) তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তা নিকৃষ্ট স্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের অবস্থা তাদের ষড়যন্ত্র ও কষ্ট দেওয়া এবং সেজন্য তাদের আযাবের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কোরআনের বর্ণনারীতি অনুযায়ী এখানে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের অবস্থা এবং তাদের সওয়াবের বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত। কাজেই আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাই বিবৃত হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে মুনাফিকীন ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদের অবস্থা তুলনা-মূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু একটি জায়গায় মুনাফিকদের বেলায় بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ বলা হলেও এর তুলনা করতে গিয়ে মু'মিনদের আলোচনা এলে সেখানে بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের

পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ শুধুমাত্র বংশগত সমন্বয় ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কাজেই তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয়, না তাতে সে ফল লাভ সম্ভব হতে পারে, যা আন্তরিক ভালবাসা ও আত্মিক সহানুভূতির মাধ্যমে হতে পারে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ একে অপরের আন্তরিক বন্ধু এবং সত্যিকার মহানুভব।—(কুরতুবী)

আর তাদের এ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি যেহেতু একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হয়ে থাকে, কাজেই তা প্রকাশ্যে, গোপনে এবং উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে একই রকম হয় এবং চিরকাল স্থায়ী হয়। নিষ্ঠাবান মু'মিনের লক্ষণও এটিই। ঈমান ও নেক আমলের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারেই কোরআন করীম বলছে : سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলের পাবন্দী অবলম্বন করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিক গভীর বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেন। বর্তমানকালে আমাদের ঈমান ও সৎকর্মের ত্রুটির কারণেই মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে এমনটি দেখা যায় না ; বরং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পড়েছে।

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফির ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফির তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জিহাদ অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবিতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে।
—(কুরতুবী, মাযহারী)

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ-এতে غِلْظَةٌ-এর প্রকৃত অর্থ হল এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোন রকম রেয়ায়েত বা কোমলতা যেন না করা হয়। এ শব্দটি رَأْفَت -এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল কোমলতা ও করুণা।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, এক্ষেত্রে غلظت শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরীয়তের হুকুম জারি করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা নবী-রসূলগণের রীতি বিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটূবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها

"যদি তোমাদের কোন ক্রীতদাসী খিনায় লিপ্ত হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভৎর্সনা বা গালাগালি করো না।" —(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"আপনি যদি কটুবাক ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রীতিনীতিতেও কোথাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফির ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইসলাম যেখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে غلظت বা কটুবাক্য অবলম্বন করেনি, ইদানীংকালে মুসলমান অপর মুসলমানদের সম্পর্কে অবলীলাক্রমে তাই ব্যবহার করে চলেছে এবং কিছু লোক তো এমনও রয়েছে যারা একে দীনের খিদমত বলে মনে করে আনন্দিত হয়ে থাকে।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ
إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۚ
وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ وَمِنْهُمْ
مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ
الصَّالِحِينَ ۝ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ
مُعْرِضُونَ ۝ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ
بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

(৭৪) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুত এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ্ তা'আলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখিরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী সমর্থক নেই। (৭৫) তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। (৭৬) অতপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গিয়েছে তা ভেঙ্গে দিয়ে। (৭৭) তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা লংঘন করেছিল এবং এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। (৭৮) তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্ তাদের রহস্য ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কসম খেয়ে ফেলে যে, আমরা অমুক কথা [যেমন, রসূল (সা)-কে হত্যা করা হোক,] বলিনি। অথচ নিশ্চিতই তারা এ কুফরী কথা বলেছিল। [কারণ, রসূল (সা)-কে হত্যা করা সম্পর্কে সলাপরামর্শ করা যে কুফর তা বলাই বাহুল্য।] আর (সে কথা বলে তারা) নিজেদের (বাহ্যিক) ইসলামের পর (প্রকাশ্যতও) কাফির হয়ে গেছে। (যদিও তারা তা নিজেদের সমাবেশেই বলেছিল, কিন্তু মুসলমানরাও তা জেনে ফেলে এবং এতে সাধারণের সামনেও তাদের এ কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়ে।) আর তারা এমন বিষয়ে ইচ্ছা করেছিল যা তাদের হাতে এলো না। [অর্থাৎ রসূল (সা)-কে হত্যার ইচ্ছা তারা করেছিল, কিন্তু তাতে বিফল হয়।] আর এমন করে তারা সে বিষয়েই বদলা দিয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদেরকে আল্লাহ্র রিযিকের মাধ্যমে সম্পদশালী করেছিলেন। (তাদের কাছেও এ অনুগ্রহেরই হয়তো বদলা ছিল মন্দ করা।) সুতরাং (তারপরেও) যদি তারা তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য (উভয় জগতে) কল্যাণ (ও মঙ্গল) হবে। [বস্তুত জাল্লাস (রা)-এর তওবা করার তৌফিক লাভ হয়ে যায়।] আর যদি (তওবা করতে) অসম্মত হয় (এবং কুফরীতে অটল থাকে), তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে (উভয় কূলে) বেদনাদায়ক শাস্তি দান করবেন। (সুতরাং সারা জীবন বদনাম, পেরেশান ও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা এবং মৃত্যুকালে কঠিন বিপদ প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতিই হচ্ছে পার্থিব আযাব।

আর আখিরাতে দোযখ বাস তো আছেই।) তাছাড়া দুনিয়াতে তাদের জন্য না আছে কোন বন্ধু, না আছে কোন সহায় (যে আযাব থেকে রক্ষা করবে। বস্তুত দুনিয়াতে যখন কোন সমর্থক, সাহায্যকারী নেই যেখানে সাধারণত কেউ না কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেই, সুতরাং আখিরাতে সাহায্য লাভের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।) আর এ সব (মুনাফিক) লোকদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতিজ্ঞা করে— [কারণ, রসূল (সা)-এর সাথে ওয়াদা করাই আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করার শামিল। আর সে ওয়াদা এই যে,] যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে (অনেক ধনসম্পদ) দান করেন, তাহলে আমরা (তা থেকে) যথেষ্ট (পরিমাণে) দান-খয়রাত করব এবং (তার মাধ্যমে) আমরা প্রচুর সৎ কাজ সম্পাদন করব। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে (বিপুল সম্পদ) দান করেন, তখন তাতে কার্পণ্য করতে শুরু করে ---(তার যাকাত দানে বিরত থাকে) এবং (আনুগত্যে) বিমুখতা করতে থাকে। তারা যে (পূর্ব থেকেই) বিমুখতায় অভ্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (এ কাজের) শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরে কুটিলতা বদ্ধমূল করে দেন, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তনের দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) বলবত থাকবে। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং এ কারণে যে, (তারা এই ওয়াদার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই) মিথ্যা বলছিল (অর্থাৎ তখনও এ ওয়াদা পূরণের নিয়ত ছিল না। কাজেই তখনও তাদের মনে কুটিলতা ও মুনাফিকীই বিদ্যমান ছিল। আর তারই শাখা হল মিথ্যাচরণ ও ওয়াদা ভঙ্গ করা। অতপর এই মিথ্যা ও ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তারা অধিকতর গযবের যোগ্য হয়ে পড়ে এবং এই গযবের আধিক্যের পরিণতি হয়েছে এই যে, পূর্ববর্তী কুটিলতাই এখন স্থায়ী হয়ে যায়, যাতে তাদের ভাগ্যে তওবাও জুটবে না এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অনন্তকাল যাবত জাহান্নামবাসী হবে। আর গোপন কুফরী সত্ত্বেও যে তারা ইসলাম প্রকাশ করে তবে) কি সে মুনাফিকরা এ খবর জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন রহস্য ও তাদের গোপন সলাপরামর্শ সবই জানেন। এবং (তারা কি জানে না যে,) গায়েবের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত? সুতরাং তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও আনুগত্য তাদের কোন কাজেই লাগতে পারে না; বিশেষত আখিরাতে। অতএব, জাহান্নামের শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াত يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ-তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরী সব কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের শুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (র) এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) গযওয়ায়ে তাবুকের

ক্ষেত্রে এক ভাষণ দান করেন, যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজে বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সা) যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রা) নামক এক সাহাবী শুনে ফেলেন এবং বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রা) এ ঘটনা মহানবী (সা)-কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রা) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়কে 'মিম্বরে নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে! হযরত আমের (রা)-এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ্! আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বলেন। অতপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীল আমীন ওহী নিয়ে হাযির হন, যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন আমি স্বীকার করছি যে এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমের ইবনে কায়েস (রা) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়।---(মাযহারী)

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষত এজন্য যে, আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا অর্থাৎ তারা এমন এক কাজের চিন্তা করল, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি এমন কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, যাতে মুনাফিকরা মহানবী (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করেছিল যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বারজন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসে ছিল যে, মহানবী (সা) যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে হযরত জিবরীল আমীন

তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীন চক্রান্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াত ঃ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ এটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী (রা)-এর রিওয়ায়েতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবাহ্ ইবনে হাতেব আনসারী রসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল যে, হুযূর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করে দিলেন, যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে মহানবী (সা)-র সঙ্গে আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত, যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম্আর নামাযের জন্য সে মদীনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামায সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুম্আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশি বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রসূলে করীম (সা) একথা শুনে তিনবার বললেন— يا ويح ثعلبة অর্থাৎ সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস!

ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদ্‌কার আয়াত নাযিল হয়, যাতে রসূলে করীম (সা)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদ্‌কা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) তিনি পালিত পশুর সদ্‌কার যথাযথ আইন প্রণয়ন করিয়ে দু'জন লোককে সদ্‌কা উসুলকারী বানিয়ে মুসলমানদের পালিত পশুর সদ্‌কা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা'লাবাহ্‌র কাছে যান। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন।

এরা উভয়ে যখন সা'লাবাহ্‌র কাছে গিয়ে পৌঁছাল এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র লিখিত ফরমান দেখাল, তখন সা'লাবাহ্‌ বলতে লাগল, এ তো 'জিযিয়া' কর হয়ে গেল যা অমুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হয়! তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। এঁরা চলে যান।

আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সা)-র ফরমান শুনল, তখন নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদ্‌কার নিসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রসূল (সা)-এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হাযির হলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বারবার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশিতে এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন।

অতপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানের সদ্‌কা আদায় করে সা'লাবাহ্‌র কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদ্‌কার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এতো এক রকম জিযিয়া করই হয়ে গেল যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া উচিত নয়। যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি পরে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

যখন এরা মদীনায় ফিরে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন যা পূর্বে বলেছিলেন। অর্থাৎ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ (অর্থাৎ সা'লাবাহ্‌র উপর আফসোস!) কথাটি তিন তিন বার বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশি হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ্‌ যদি তাদের ধনসম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন

ও গরীব-মিসকীনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফিকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন যাতে তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ এতে বোঝা যায় যে, কোন কোন অসৎ কর্মের এমন অশুভ পরিণতি ঘটে যে, তাতে তওবা করার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। 'নাউযুবিল্লাহি মিনহু' (এহেন অবস্থা থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই)।

হযরত আবূ উমামাহ্ (রা)-র সে বিস্তারিত রিওয়ায়েতের পর—যা এইমাত্র উল্লেখ করা হল, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সা'লাবাহ্র يا ويح ثعلبة তিন তিন বার বলেন, তখন সে মজলিসে সা'লাবাহ্র কতিপয় আত্মীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিল। হুযূর (সা)-এর এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবাহ্র কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সা'লাবাহ্ ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাযির হয়ে নিবেদন করল, হুযূর। আমার সদ্কা কবূল করে নিন। নবী করীম (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার সদ্কা কবূল করতে বারণ করে দিয়েছেন। একথা শুনে সা'লাবাহ্ নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল।

হুযূর (সা) বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর তোমার সদ্কা কবূল হতে পারে না। তখন সা'লাবাহ্ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী (সা)-র ওফাত হয়ে যায়। অতপর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হলে সা'লাবাহ্ সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে তার সদ্কা কবূল করার আবেদন জানাল। সিদ্দীকে আকবর (রা) উত্তর দিলেন, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই কবূল করেন নি, তখন আমি কেমন করে কবূল করব!

তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ওফাতের পর সা'লাবাহ্ ফারূকে আযম (রা)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং সে আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে আকবর (রা) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলেও সে এ নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালেই সা'লাবাহ্র মৃত্যু হয়।---(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সা'লাবাহ্ যখন তওবা করে উপস্থিত হয়েছিল তখন তার তওবাটি কবুল হল না কেন। এর কারণ, অতি পরিষ্কার; রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, সে এখনও নিষ্ঠার সাথে তওবা করেনি। তার মনে এখনও নেফাক তথা কুটিলতা রয়ে গেছে। শুধু সাময়িক কল্যাণ কামনায় মুসলমানগণকে প্রতারিত করে রাযী করতে চাইছে মাত্র। কাজেই এ তওবা কবুলযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-ই যখন তাকে মুনাফিক সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, তখন পরবর্তী খলীফাগণের পক্ষে তার সদ্‌কা কবুল করার কোন অধিকারই অবশিষ্ট থাকেনি। কারণ, যাকাতের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। অবশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পর যেহেতু কারো অন্তরে নেফাক বা কুটিলতা নিশ্চিতভাবে কেউ জানতে পারে না, কাজেই পরবর্তী কালের জন্য হুকুম এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে নেবে এবং ইসলাম ও ঈমান স্বীকার করে নেবে তার সাথে মুসলমানদের মতই আচরণ করতে হবে, তার মনে যাই কিছু থাক না কেন। —(বয়ানুল কোরআন)

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ
لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط سَخِرَ اللّٰهُ
مِنْهُمْ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٧٩ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْفٰسِقِيْنَ ۝٨٠

(৭৯) সে সমস্ত লোক যারা ভৎর্সনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। অতপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (৮০) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌কে এবং তার রসূলকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত আল্লাহ্ না-ফরমানদেরকে পথ দেখান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এসব (মুনাফিক) লোকগুলো এমন যে, নফল সদ্‌কা দানকারী মুসলমানদের প্রতি সদ্‌কার পরিমাণের স্বল্পতার ব্যাপারে বিদ্রূপ-ভৎর্সনা করে। (বিশেষত) সেসব

লোকদের প্রতি (আরো বেশি) বিদ্রূপ করে যাদের কাছে শুধুমাত্র মেহনত-মযদুরী (আয়) ব্যতীত আর কোন কিছুই থাকে না। (আর যে বেচারীরা এরই মধ্য থেকে সাহস করে কিছু সদ্‌কা-খয়রাত করে) তাদের প্রতি বিদ্রূপও করে। (অর্থাৎ সাধারণ বিদ্রূপ-ভর্ৎসনা তো সবার প্রতিই করে যে, সামান্য বস্তু খয়রাত করতে নিয়ে এসেছে। তদুপরি এসব মেহনতী গরীবদের প্রতি ঠাট্টাও করে যে, এটাও কি একটা খয়রাত করার মত জিনিস হলো নাকি? আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এসব ঠাট্টা-বিদ্রূপের (বিশেষ ধরনের) বদলা তো দেবেনই, তদুপরি (সাধারণ ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য এই বদলা পাবে যে,) তাদের জন্য (আখিরাতে) হবে বেদনাদায়ক শাস্তি। আপনি সেসব মুনাফিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর না করুন (দুইই সমান—এতে তাদের এতটুকু লাভ হবে না। তারা ক্ষমা পাবে না। এমনকি) আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও (অর্থাৎ অনেক করেও) ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এহেন উদ্ধত লোকদেরকে হিদায়ত দান করেন না, যারা কখনো ঈমান ও সৎপথের অন্বেষণ করে না (কাজেই সারা জীবনই এরা কুফরীতে থেকে মরে যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতটিতে নফল সদ্‌কা দানকারী মুসলমানদের প্রতি মুনাফিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ মাসউদ (রা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি এমন অবস্থায় সদ্‌কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যখন আমরা মেহনতী-মযদুরী করতাম। (অতিরিক্ত কোন সম্পদ আমাদের কাছে ছিল না; সে শ্রমের কামাই থেকেই যা আমরা পেতাম তারই মধ্য থেকে সদ্‌কা-খয়রাতের জন্যও কিছু বের করে নিতাম।) সুতরাং আবূ আকীল (রা) অর্ধ সা' (প্রায় পৌনে দুই সের) সদ্‌কা হিসাবে পেশ করেন। অপর এক লোক এসে কিছু বেশি পরিমাণ সদ্‌কা দেয়। এরই উপর মুনাফিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে যে, কি সামান্য ও নিকৃষ্ট বস্তু সদ্‌কা করতে নিয়ে এসেছে দেখ! এমন বস্তুতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। আর যে লোক কিছুটা বেশি সদ্‌কা করেছিল, তার উপর এ অপবাদ আরোপ করল যে, সে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদ্‌কা করেছে। তারই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ আয়াতে ঠাট্টার পরিণতিকে ঠাট্টা বলেই বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মহানবী (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই সমান। তাছাড়া ক্ষমা প্রার্থনা

যতই করুন না কেন, তাদের ক্ষমা হবে না। এর বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তী আয়াত ঃ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم —এর আওতায় আসবে।

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَٰهِدُوا بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِى الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَٰتِلُوا مَعِىَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْخَٰلِفِينَ ﴿٨٣﴾

(৮১) পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্‌র রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।—বলে দাও উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। (৮২) অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশি কাঁদবে। (৮৩) বস্তুত আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণীবিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বেরোবার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বেরোবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছ, কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে বসেই থাক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পেছনে পড়ে থাকা লোকগুলোও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র (চলে যাবার) পর নিজেদের (যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে) বসে থাকার জন্য আনন্দিত হয়েছে এবং তারা নিজেদের মাল ও জানের দ্বারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করতে পছন্দ করেনি (দু'টি কারণে—তার একটি হল কুফরী এবং অপরটি আরামপ্রিয়তা)। আর (তারা অন্যদেরও)

বলতে শুরু করেছে যে, তোমরা (এহেন কঠিন) গরমে (ঘর ছেড়ে) বেরিয়ো না। আপনি (উত্তরে) বলে দিন যে, জাহান্নামের আগুন (এর চেয়েও অনেক) বেশি গরম (ও তীব্র। সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমরা এই গরম থেকে বাঁচার চেষ্টা করছ অথচ জাহান্নামে যাবার ব্যবস্থাও নিজেরাই করছ; কুফরী ও বিরোধিতা পরিহার করছ না।) কতই না ভাল ছিল যদি তারা বুঝত! বস্তুত (উল্লিখিত বিষয়টির পরিণতি হল এই যে, দুনিয়ায়) এরা সামান্য সময় হেসে (খেলে) নিক, (পরবর্তীতে) বহুদিন ধরে (অর্থাৎ চিরকাল) কাঁদতে থাকবে! (অর্থাৎ তাদের হাসি-আনন্দ অল্পকালের আর কান্না হল চিরদিনের জন্য। তা তাদের) সেসব কাজেরই পরিণতি হিসাবে (পাবে) যা তারা (কুফরী, মুনাফিকী ও বিরোধিতা প্রভৃতির মাধ্যমে) অর্জন করেছে। (তাদের অবস্থার বিষয় যখন জানা হয়ে গেল,) তখন আল্লাহ্ তা'আলা যদি আপনাকে (এ সফর থেকে মঙ্গলমত মদীনায়) এদের কোন দলের নিকট ফিরিয়ে আনেন—(এখানে কোন দলের নিকট কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, হয়তো বা তখনো পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ মরেও যেতে পারে কিংবা অন্য কোথাও চলে যেতে পারে।) আর তখন এরা (আপনার মনস্তুষ্টি ও অপরাধ স্খলনের জন্য অন্য কোন জিহাদে আপনার সাথে) যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে (যেহেতু তখনো তাদের মনে এই ইচ্ছাই থাকবে যে, ঠিক কাজের সময়ে কোন ছলছুঁতা করবে। কাজেই,) তখন আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন যে, (যদিওবা এখন তোমরা পার্থিব লাভের ভিত্তিতে বানিয়ে কথা বলছ, কিন্তু) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরের গোপন কথা বাতলে দিয়েছেন। (কাজেই আমি একান্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি যে), তোমরা আর কখনোই আমার সাথে জিহাদে যেতে পারবে না। আর নাইবা অমার সঙ্গী হয়ে (দীনের) কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে (আর এই হলো যাবার আসল উদ্দেশ্য। কারণ,) তোমরা পূর্বেও বসে থাকা পছন্দ করেছিলে (এবং এখনোও তোমাদের তাই সংকল্প) সুতরাং (অনর্থক মিথ্যা কথা কেন বানাচ্ছ। বরং আগের মত এখনো) তাদের সাথেই বসে থাক (যারা বস্তুতই) পেছনে থাকার যোগ্য (কোন ওযর অপারকতার দরুন। যেমন, বৃদ্ধ, শিশু ও নারী প্রভৃতি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। আলোচ্য আয়াত-গুলোতেও তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখিরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহিদীনের তালিকা থেকে কেটে দেয়া এবং পরবর্তী কোন জিহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

مُخَلَّفُونَ শব্দটি مُخَلَّف—এর বহুবচন। অর্থ 'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ যাকে পরিহার করা বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথ

মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে শামিল হতে হয়নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জিহাদ 'বর্জনকারী' নয়; বরং জিহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ এতে خلاف অর্থাৎ 'পেছনে' বা 'পরে'। আবু ওবায়দা (র) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয়ই নয়। بِمَقْعَدِهِمْ শব্দটি এখানে قعود (বসে থাকা) এর ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خلاف অর্থ مخالفت তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ এরা রসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্য লোকদেরকেও এ কথাই বোঝাল যে, لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ অর্থাৎ (এমন) গরমের সময়ে জিহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন : قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুত এর ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাফরমানীর দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশি? অতপর বলেন :

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا ----এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম, কাঁদো বেশি'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তফসীরবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখিরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে,

الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤا فاذا انقطعت الدنيا وصاروا الى الله فليستأنفوا البكاء بكاء لا ينقطع ابدا -

অর্থাৎ দুনিয়া সামান্য কয়েকদিনের অবস্থান স্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।—(মাযহারী)

দ্বিতীয় আয়াতে لَنْ تَخْرُجُوا বলা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর মর্মার্থ নেয়া হয়েছে যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বেকার মতই নানা রকম ছলছুঁতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী (সা)-র প্রতি নির্দেশ হল যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জিহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়।

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۭ
اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

(৮৪) আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা না-ফরমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ মরে যায়, তবে তার উপর কখনও (জানাযার) নামায পড়বেন না (এবং তাদেরকে দাফন করার জন্য) তার কবরেও দাঁড়াবেন না। (কারণ,) তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলের প্রতি কুফরী করেছে এবং তারা সেই কুফরী অবস্থায়ই মারা গেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে সহীহ্ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ আয়াতটি মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সহীহাইন (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত

রয়েছে যে, তার জানাযায় রসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়েন। নামায পড়ার পরই এ আয়াত নাযিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েননি।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনায় এ আয়াত নাযিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তাহল এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ্ যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন হুযূর (সা)-এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হুযূর! আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রসূলে করীম (সা) নিজের জামা মুবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। হুযূর (সা) তাও কবুল করেন। জানাযার নামাযে দাঁড়ালে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হুযূর (সা)-এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ্ আপনাকে মুনাফিকের নামায পড়তে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছেন---মাগফিরাতের দোয়া করব অথবা করব না। আর সে আয়াতে যাতে সত্তর বার মাগফিরাতের দোয়া করলেও ক্ষমা হবে না বলে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সত্তর বারের বেশিও ইস্তেগফার করতে পারি। সে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূরা তওবার ঐ আয়াত যা এইমাত্র পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ—اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় لَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا.....(সুতরাং এরপর খকনও তিনি কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।)

উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রথমত প্রশ্ন উঠে এই যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই এর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা) এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মুবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন?

উত্তর এই যে, এর দু'টি কারণ থাকতে পারে ঃ এক. তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন তাঁর আবেদন। অর্থাৎ শুধুমাত্র তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি এমনটি করেছিলেন। দুই. অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কুরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী (সা)-র চাচা আব্বাসও ছিলেন। হুযূর (সা) দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদেরকে

বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মত লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সে এহসানের বদলা হিসেবেই মহানবী (সা) নিজের জামা মুবারকখানা তাকে দিয়ে দেন।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারূকে আযম (রা)-যে মহানবী (সা)-কে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মুনাফিকদের নামায পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? কারণ, ইতিপূর্বে কোন আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উমর বারণের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত استغفر لهم ---------থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাযের বারণের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, তবে মহানবী (সা) এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না কেন; বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে।

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলীর বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তর বারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বোঝাবার জন্য নয়, বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফিরাত হবে না; যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুযূরকে বারণও করা হয়নি। কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে যা সূরা ইয়াসীনে উক্ত হয়েছে তাতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ -

এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে দীনের তবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি, বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয় ঃ- بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ অথবা إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রভৃতি।

সারকথা এই যে, أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ আয়াতের দ্বারা তো মহানবী (সা)-কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য

আয়াতে নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী (সা) উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের মাগফিরাত হবে না! কিন্তু অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাঁকে ভীতি প্রদর্শনে বাধাও দেয়া হয়নি।

আর মহানবী (সা) জানতেন যে, আমার কামীসের কারণে কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফিরাত তো হবে না, কিন্তু এতে অন্যান্য দীনী কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্য কাফিরগণ যখন হুযূর (সা)-এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে, তখন তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু (মুনাফিকের) জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়ে নেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ্ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সত্তর বারের বেশি দোয়া ও মাগফিরাত কামনায় তার মাগফিরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম।----(কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সে হাদীস যাতে মহানবী (সা) বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোন কোন তফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হুযূর (সা)-এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের এ কাজের দরুন এই মুনাফিকের মাগফিরাত তথা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলীতে বাহ্যত এই অধিকার দেয়া হয়েছিল; অন্য কোন আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপরদিকে একজন কাফিরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্য কাফিরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, কাজেই তিনি নামায পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারূকে আযম (রা) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফিরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাযে জানাযা পড়ে মাগফিরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রসূলে মকবুল (সা) যদিও এ কাজটিকে মূলত কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রসূলে করীম (সা)-এর কাজের উপর কোন আপত্তি থাকে, না ফারূকে আযম (রা)-এর কথায় কোন প্রশ্ন উঠতে পারে।----(বয়ানুল কোরআন)

অবশ্য পরিষ্কারভাবে যখন لَا تُصَلِّ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল, তখন প্রতীয়মান হল যে, যদিও জানাযার নামায পড়ার পেছনে একটি দীনী কল্যাণ নিহিত ছিল, কিন্তু এতে একটি অপকারিতাও বিদ্যমান ছিল। সেদিকে মহানবী (সা)-র খেয়াল হয়নি। তা ছিল এই যে, স্বয়ং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনে এ কাজের দরুন উৎসাহহীনতা সৃষ্টির আশংকা ছিল যে, তাঁর নিকট নিষ্ঠাবান মুসলমান ও মুনাফিক সবাইকে একই পাল্লায় মাপা হয়। এ আশংকার প্রেক্ষিতে কোরআনে এই নিষেধাজ্ঞা নাযিল হয়। অতপর মহানবী (সা) কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েননি।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন কাফিরের জানাযার নামায পড়া এবং তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফিরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা যিয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের কোন কাফির আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোন ওলী-ওয়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান আত্মীয় সুন্নত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁততে পারে।—(বয়ানুল কোরআন)

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ
بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا أُنْزِلَتْ
سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ
مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا
مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

(৮৫) আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ্ তো এই চান যে, এ সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভেতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফিরই থাকে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র উপর, তাঁর রসূলের সাথে একাত্ম হয়ে, তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। (৮৭) তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুত তারা বোঝে না। (৮৮) কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তার সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে (৮৯) আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কানন কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে (এমন) বিস্ময়ে না ফেলে (যে, এহেন ধিকৃত ব্যক্তি এই নিয়ামতরাজি কেমন করে পেল? প্রকৃতপক্ষে এগুলো তাদের জন্য নিয়ামত নয়, বরং আযাবেরই উপকরণ বিশেষ। কারণ) আল্লাহ্ শুধু এ কথাই চান, যেন (উল্লিখিত) এসব বস্তু-সামগ্রীর কারণে দুনিয়াতেও তাদেরকে আযাবে আবদ্ধ করে রাখেন এবং তাদের প্রাণ কাফির অবস্থায় নির্গত হয় (যাতে তারা আখিরাতেও আযাবেই লিপ্ত থাকে)। আর কখনও কোরআনের কোন অংশ বিশেষ যখন এ ব্যাপারে নাযিল করা হয় যে, তোমরা (নিষ্ঠার সাথে) আল্লাহ্র উপর ঈমান আন এবং তাঁর রসূলের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ কর, তখন তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা আপনার নিকট অব্যাহতি কামনা করে। আর এ বলে অব্যাহতি চায় যে, আমাদের অনুমতি দান করুন যাতে আমরা এখানে অবস্থানকারী লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। (অবশ্য ঈমান ও নিষ্ঠার দাবি করতে গিয়ে কোন কিছুই করতে হয় না; শুধু বলে দিল যে, আমরা নিষ্ঠাবান।) এসব লোক (চরম অসহযোগী মনোভাবের দরুন) পুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে রাযী হয়ে গেল এবং তাদের অন্তরে মোহর এঁটে গেল, যাতে করে তারা (সহযোগিতা ও অসহযোগিতাকে) উপলব্ধিই করতে পারে না। কিন্তু রসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলমান, তারা (অবশ্য এ নির্দেশ মেনে নিলেন এবং) নিজেদের মালামাল ও জানের দ্বারা জিহাদ করলেন। বস্তুত তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। আর এরাই হলেন পরম কৃতকার্য। (আর সে কল্যাণ ও কৃতকার্যতা এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য এমন কাননকুঞ্জ

নির্ধারিত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণসমূহ (আর) তারাও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফিকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নিয়ামত পাবে?

এর উত্তরে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন রহ্‌মত ও নিয়ামত নয়; বরং পার্থিব জীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাববিশেষ। আখিরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধনসম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধনসম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখিরাত সম্পর্কে গাফিল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসেবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত ধনসম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولُوا الطَّوْلِ শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সম্পন্ন নয় অর্থাৎ যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক ওযরও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)।

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٩٠

(৯০) আর ছলনাকারী বেদুইন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফির।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কিছু ছলনাকারী বেদুইন লোক গ্রাম থেকে এলো (যাতে তারা বাড়িতে থেকে যাবার) অনুমতি লাভ করতে পারে এবং (সেসব গ্রাম্য লোকদের মাঝে) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে (ঈমানের দাবির ব্যাপারে) সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা কথা বলেছিল, তারা, একেবারেই বসে রইল (মিথ্যা ওযর দর্শাতেও এলো না), তাদের মধ্যে যারা (শেষ পর্যন্ত) কাফিরই থেকে যাবে, তাদেরকে (আখিরাতে) বেদনাদায়ক আযাব দেয়া হবে (এবং যারা তওবা করে নেবে তারা আযাব থেকে বেঁচে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব গ্রামবাসীর মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। এক—যারা ছলছুঁতা পেশ করার জন্য মহানবী (সা)-র খিদমতে হাযীর হয় যাতে তাদেরকে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) যখন বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) জাদ্দ ইবনে কায়েসকে জিহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন কতিপয় মুনাফিকও খিদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছলছুঁতা পেশ করে জিহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওযর পেশ করছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওযর কুফরী ও মুনাফিকীর কারণে ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফিরদের আযাবের আওতাভুক্ত নয়।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا

أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا
وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ
رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

(৯১) দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯২) আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুত তারা জানতেও পারেনি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্বল্পক্ষম লোকদের উপর কোন গোনাহ্ নেই, রুগ্ন লোকদের উপরও কোন গোনাহ্ নেই এবং সেসব লোকদের উপরও কোন গোনাহ্ নেই যাদের কাছে (জিহাদের উপকরণ প্রস্তুতি বাবদ) ব্যয় করার মত কোন সামর্থ্য নেই—যখন এরা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে (এবং তাঁদের হুকুম-আহ্কামের ব্যাপারে) নিষ্ঠা অবলম্বন করে (এবং অন্তরে আনুগত্য পোষণ করে---) এমন নেককারদের উপর কোন রকম অভিযোগ (আরোপিত) হবে না। কারণ, لا يكلف الله نفسا الا وسعها আর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (যদি এরা নিজেদের জ্ঞানমতে অপারক হয়ে থাকে এবং নিজেদের দিক থেকে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের চেষ্টাও করে, কিন্তু বাস্তবে তাতে সামান্য কমতি থেকে যায়, তবে তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন।) আর না সে সমস্ত লোকের উপর (কোন পাপ ও অভিযোগ আছে---) যারা আপনার নিকট আসে, যাতে আপনি তাদের জন্য কোন বাহন ব্যবস্থা করেন; অথচ আপনি (তাদের) বলে দেন যে, আমার কাছে যে তোমাদের সওয়ার করাবার মত কোন বাহনই নেই। তখন তারা (ব্যর্থ

মনোরথ হয়ে) ফিরে যায় এমন অবস্থায় যে, তাদের চোখে অশ্রু ধারা বইতে থাকে এই দুঃখে যে, (আফ্‌সোস।) তাদের কাছে (জিহাদের উপকরণ সংগ্রহ) ব্যয় করার মত কিছু নেই। (না আছে নিজের কাছে, না পাওয়া গেল অন্য কোনখান থেকে। বস্তুত এহেন অপারক লোকদের কোন রকম জওয়াবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না।) বস্তুত অপরাধ (ও শাস্তিভোগ) তো শুধু তাদের উপর আরোপ করা হয়, যারা ধন-সম্পদে সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও (ঘরে বসে থাকার) অনুমতি কামনা করে। তারা (চরম অসহযোগী মনোভাবের দরুন) পুরবাসিনীদের সাথে এমতাবস্থায় রয়ে যেতে সম্মত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন যাতে তারা (পাপ-পুণ্যের বিষয়) জানতেই পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত আয়াতসমূহে এমন সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণে অপারক ছিল না, কিন্তু শৈথিল্যবশত অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফিক বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরী ও কুটিলতা হেতু নানারকম ছলছুঁতার আশ্রয়ে রসূলে করীম (সা)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত দর্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত থেকে গেছে। এদের অপারক না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আযাব হওয়ার ব্যাপারটি বিগত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপারকতার দরুন জিহাদে অংশগ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারক এবং যাদের অপারকতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জিহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুত সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জিহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপারকতার কথা জানিয়ে রসূলে করীম (সা)-এর নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা হোক।

তফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রসূলে করীম (সা) তাদের কাছে নিজের অপারকতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারী বা যানবাহনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই হুযূর (সা)-এর নিকট ছয়টি উট্ট এসে যায় এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন।---(মাযহারী) তাদের মধ্যে তিন

জনের সওয়ারীর ব্যবস্থা করেন হযরত ওসমান গনী (রা)। অথচ ইতিপূর্বে তিনি বিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা নিজ খরচে করেছিলেন।

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্তও কোন সওয়ারীর ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে তারা জিহাদে বিরত থাকে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যাদের অপারকতা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জিহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে নিয়েছে। إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ—এর মর্মও তাই।

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا
تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا
انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا
عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

(৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুঁতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল করো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ্ই দেখবেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (৯৫) এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহ্র কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর---নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। (৯৬) তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাযী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ্ তা'আলা রাযী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এসব লোক তোমাদের (সবার) সামনে অপারকতা পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে। অতএব, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি (সবার পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে) বলে দিন যে, (থাক,) এ ওযর পেশ করো না, আমরা কক্ষণো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না। (কারণ,) আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের (প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে) সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন (যে, তোমাদের সত্যিকার কোন ওযরই ছিল না)। আর (সে যাহোক,) আগামীতেও আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখে নেবেন। (তখনই দেখা যাবে তোমাদের ধারণামতে তোমরা কতটা অনুগত ও নিষ্ঠাবান।) অতপর এমন সত্তার নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সমুদয় বিষয় সম্পর্কে অবগত। (তাঁর সামনে তোমাদের কোন বিশ্বাস এবং কোন কার্যকলাপই গোপন নয়।) তারপর তিনি তোমাদের (সেসবই) বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (আর তার বদলাও দেবেন।) তবে হ্যাঁ, তারা এখন তোমাদের সামনে আল্লাহ্র কসম খেয়ে যাবে (যে, আমরা অপারক ছিলাম)---যখন তোমরা তাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকতে দাও (এবং ভৎর্সনা প্রভৃতি না কর)। কাজেই তোমরা তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দাও (এবং) তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই থাকতে দাও। (এই ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্য হাসিলে তাদের কোন কল্যাণই সাধিত হবে না। কারণ,) সেসব লোক একেবারেই অপবিত্র। (আর শেষ পর্যন্ত) তাদের ঠিকানা হল দোযখ---সে সমস্ত কাজের পরিণতি হিসেবে যা তারা (কুটিলতা ও বিরোধিতার মাধ্যমে) করছিল। (তাছাড়া এর তাকাদাও এই যে, তাদেরকে স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হোক। কারণ, উপেক্ষা করার উদ্দেশ্য হল সংশোধন। অবশ্য তাদের এহেন দুর্মতিত্বে তারও কোন সম্ভাবনা নেই। আর) এরা এ কারণেও কসম খাবে যাতে তুমি তাদের উপর সন্তুষ্ট বা রাযী হয়ে যাও। (বস্তুত একে তো তুমি আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতি রাযী হতে যাবেই বা কেন। তবে) যদি (মনে করা হয় যে,) তুমি তাদের প্রতি রাযী হয়েই গেলে (কিন্তু তাতে তাদের কিই লাভ,) আল্লাহ্ তা'আলা যে এমন (দুষ্ট) লোকদের প্রতি রাযী হচ্ছেন না। (অথচ স্রষ্টার সন্তুষ্টি ছাড়া সৃষ্টির সন্তুষ্টি একান্তই অর্থহীন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফিকের আলোচনা ছিল যারা গযওয়ায়ে তাবুকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দর্শিয়ে জিহাদে যাওয়া থেকে অপারকতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর রসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনায় তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফিকরা ওযর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুত ঘটনাও তাই ঘটে।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে--(এক) যখন এরা আপনার কাছে ওযর-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, খামাখা মিথ্যা ওযর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দুষ্টুমি এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন রকম ওযর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তারপর বলা হয়েছে ঃ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ .. এতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, এখনও যেন তারা মুনাফিকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ, এতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন্ ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তোমাদের কোন উপকারই সাধন করবে না।

(দুই) দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি যেন তাদের জিহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সে জন্য যেন কোন ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই বাসনা পূরণ করে দিন। فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভর্ৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ, ভর্ৎসনা করে কোন ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই বা কি হবে। খামাখা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

(তিন) তৃতীয় আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাযী করাতে চাইবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়ত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাযী হবেন না। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাযী হয়ে গেলেন বলে যদি ধরেও নেয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবে না এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরী ও মুনাফিকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ তা'আলা কেমন করে রাযী হবেন।

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ

اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ
اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝

(৯৭) বেদুইনরা কুফর ও মুনাফিকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। (৯৮) আবার কোন কোন বেদুঈন এমনও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক! আর আল্লাহ্ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (৯৯) আর কোন কোন বেদুইন হল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো! তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এই মুনাফিকদের মধ্যে যারা) বেদুইন তারা (স্বভাবজাত কঠোরতার কারণে) কুফরী ও মুনাফিকীর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কঠোর এবং (জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী লোকদের থেকে দূরত্বের কারণে) তাদের এমনটিই হওয়া উচিত যে, তাদের সেসমস্ত হুকুম-আহকামের জ্ঞান থাকবে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-এর উপর নাযিল করেন। (কারণ, জ্ঞানী লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হচ্ছে মূর্খতা। আর সে কারণেই স্বভাবে কঠোরতা এবং এ সমুদয়ের ফলে কুফরী ও মুনাফিকীতে প্রবলতা সৃষ্টি হবে।) আর আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন বড়ই জ্ঞানী, বড়ই কুশলী। তিনি এ সমুদয় বিষয়েই অবগত। (ফলে তিনি কুশলতার দ্বারা যথার্থ শাস্তি প্রদান করবেন।) আর (উল্লিখিত মুনাফিক) বেদুইনদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে (যারা কুফরী,

মুনাফিকী ও মূর্খতার সাথে সাথে কৃপণতা ও হিংসার দোষেও দুষ্ট।) তারা (জিহাদ ও যাকাত প্রভৃতি উপলক্ষে মুসলমানদের দেখাদেখি লজ্জাবশত) যা কিছু ব্যয় করে, তাকে (একান্ত) জরিমানা (বা অর্থদণ্ডের মতই) মনে করে। (এই তো গেল কার্পণ্যের দিক।) আর (হিংসা ও বিদ্বেষের দিক হল এই যে, তারা) তোমাদের মুসলমানদের জন্য যুগচক্রান্তের অপেক্ষায় থাকে। (যেন তাদের উপর কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা-দুর্বিপাক এসে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। বস্তুত) দুঃসময় এসব মুনাফিকদের উপরই আসবে। (সুতরাং বিজয়ের বিস্তৃতি ঘটলে কাফিররা অপদস্থ হয় এবং তাদের সমস্ত আকাংক্ষা মনেই থেকে যায়। এদের সারা জীবন দুঃখ-বেদনায় কেটে যায়।) আর আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের কুফরী ও মুনাফিকীপূর্ণ কথাবার্তা) শুনেন (এবং তাদের মনের কঠোরতা ও যুগচক্রান্তের সুযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত কামনা-বাসনা সম্পর্কে) অবগত। (সুতরাং এসবের শাস্তিই তিনি দেবেন।) আর কোন কোন বেদুইন এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে এবং (নেক কাজে) যা কিছু ব্যয় করে সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রসূল করীম (সা)-এর দোয়াপ্রাপ্তির অবলম্বন বলে গণ্য করে। [কারণ, মহানবী (সা)-এর মহত অভ্যাস ছিল যে, তিনি উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যয়কারীদের জন্য দোয়া করতেন। যেমন, হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।] 'মনে রেখো, তাদের এই ব্যয় নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কারণ। (আর দোয়ার বিষয় তো তারা নিজেরাই দেখেশুনে নিতে পারে—তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর নৈকট্য হলো এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে স্বীয় (বিশেষ) রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। (কারণ,) আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সুতরাং তাদের সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে তাদেরকে স্বীয় রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত আয়াতগুলোতে মদীনার মুনাফিকদের আলোচনা ছিল। আর বর্তমান আলোচ্য আয়াতসমূহে সেসমস্ত মুনাফিকের কথা বলা হচ্ছে যারা মদীনার উপকণ্ঠে এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত।

أَعْرَابٌ শব্দটি عَرَبٌ শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদবিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একক করতে হলে أَعْرَابِيٌّ বলা হয়। যেমন, أَنْصَار—এর এক বচন انصارى হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও মুনাফিকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশি কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা ইলম ও আলিম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা কঠোরতায় ভুগতে থাকার দরুন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে।

(أَجْدَرُ أَنْ لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ) অর্থাৎ এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ, না কোরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরীকে লুকাবার জন্য নামাযও পড়ে নেয় এবং ফরয যাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন রকমে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। اَلدَّوَائِرَ শব্দটি دَائِرَةٌ-এর বহুবচন। আরবী অভিধান অনুযায়ী دَائِرَةٌ (দায়েরাহ্) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভাল অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কোরআন করীম তাদের উত্তরে বলেছেঃ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজকর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনার কোরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সংগত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে, তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা যে সদকা-যাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দোয়াপ্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে।

সদ্‌কা যে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কোরআন-করীমে যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সদ্‌কা উসূল

করার সাথে সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صلوٰة শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতে রসূলে করীম (সা)-এর দোয়াকে صلوٰة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ
بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(১০০) আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সেসমস্ত লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনার ক্ষেত্রে সমস্ত উম্মতের মাঝে) অগ্রবর্তী এবং (বাকি উম্মতের মধ্যে) যারা নিষ্ঠার সাথে (ঈমান গ্রহণে) তাদের অনুসারী, আল্লাহ্ সেসমস্ত লোকের প্রতিই সন্তুষ্ট। (তিনি তাদের ঈমান কবুল করেছেন।) সেজন্য তারা তার সুফলপ্রাপ্ত হবে। আর তাদের সবাই আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে (এবং আনুগত্য করেছে। যার ফলে এই সন্তুষ্টিতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি হবে)। তাছাড়া আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন কাননকুঞ্জ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সদা-সর্বদা বসবাস করবে। (আর) এটাই হল মহা কৃতকার্যতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পরবর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবান বেদুইন মু'মিনদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে সাধারণ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের আলোচনা হচ্ছে, যাতে তাঁদের মর্যাদা ও ফযীলতেরও বিবরণ রয়েছে।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِنْ অব্যয়কে অধিকাংশ তফসীরবিদগণ تبعيض-এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজিরীন

ও আনসারদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং (২) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম।

এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে سابقين اولين তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেব্‌লা (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্)-এর দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন তাঁদেরকে سابقين اولين গণ্য করেছেন। এমনটি হল সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও কাতাদাহ্ (রা)-এর। হযরত আ'তা ইবনে আবী রাবাহ্ বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আওয়ালীন' হলেন সেসমস্ত সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (র)-র মতে যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার বাইআতে-রেদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্তুত প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবা মুহাজির হোক বা আনসার— সাবেকীনে আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।---(কুরতুবী, মাযহারী)

তফসীরে-মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে من অব্যয়টি আংশিককে বোঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি ; বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম অন্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। আর سابقين اولين হল তার বিবরণ। বয়ানুল কোরআন থেকে তফসীরের যে সার-সংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরামের দু'টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে রেদওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন তাঁদের ; আর দ্বিতীয় তফসীরের মর্ম হল এই যে, সাহাবায়ে কিরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ, ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তফসীর অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সেসমস্ত সাহাবায়ে কিরাম, যারা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে হুদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাঁদের পরবর্তী সেসমস্ত মুসলমানদের, যারা কিয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রি-কতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ বাক্যে সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تَابِعِى (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কিয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

সাহাবায়ে কিরাম জান্নাতী ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ঃ মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রা)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন—যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোত্থেকে বলছেন (এর প্রমাণ কি)? তিনি বললেন, কোরআন করীমের আয়াত পড়ে দেখ। اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اِتِّبَاعٌ بِاِحْسَانٍ এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের সবাই কোনরকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিধন্য হবেন।

তফসীরে মাযহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল ঃ

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আয়াতটি।

এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে।—(তিরমিযী)

জ্ঞাতব্য ঃ যেসব লোক সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং তাঁদের মাঝে সংঘটিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে কোন কোন সাহাবী সম্পর্কে এমন সমালোচনা করে,

যার ফলে মানুষের মন তাঁদের উপর কুধারণায় লিপ্ত হতে পারে, তারা নিজেদেরকে এক আশংকাজনক পথে নিয়ে ফেলছে।—আল্লাহ্ রক্ষা করুন।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

(১০১) আর কিছু কিছু তোমার আশপাশের মুনাফিক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফিকীতে অনড়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আযাব দান করব দু'বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহা আযাবের দিকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনার আশপাশের লোকদের মধ্যে কিছু এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কিছু এমন মুনাফিক রয়েছে যারা মুনাফিকীর চরম শিখরে (এমনভাবে) পৌঁছে আছে (যে,) আপনি (-ও) তাদেরকে জানেন না (যে, এরা মুনাফিক। বস্তুত) তাদেরকে আমি জানি। আমি তাদেরকে অন্য মুনাফিকদের তুলনায় আখিরাতের পূর্বে) দ্বিবিধ শাস্তি দেব। (একটি মুনাফিকীর জন্য এবং অপরটি মুনাফিকীতে পরিপূর্ণতার কারণে। আর) অতপর (আখিরাতেও) তারা অতিকঠোর ও মহাআযাব (অর্থাৎ অনন্তকাল যাবত জাহান্নামবাস)-এর জন্য প্রেরিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিগত অনেক আয়াতে সেসব মুনাফিকের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের নেফাক তথা মুনাফিকী তাদের কথা ও কাজে প্রকাশ পেয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও জানতেন যে, এরা মুনাফিক। এ আয়াতে এমন সব মুনাফিকের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যাদের মুনাফিকী অত্যন্ত চরম পর্যায়ের হওয়ার দরুন এখনও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট গোপনই রয়ে গেছে। এ আয়াতে এহেন কঠিন মুনাফিকদের উপর আখিরাতের পূর্বেই দু'রকম আযাব দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হল দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের মুনাফিকী গোপন রাখার চিন্তা এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে পতিত থাকা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আর তাদের অনুসরণে বাধ্য থাকাটাও কোন অংশে কম আযাব নয়। দ্বিতীয়ত, কবরও বরযখ-এর আযাব বা কিয়ামত ও আখিরাতের পূর্বে তারা ভোগ করবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ خُذْ مِنْ
اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝
وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ
اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَاٰخَرُوْنَ
مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(১০২) আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়! (১০৩) তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন। (১০৪) তারা কি একথা জানতে পারেননি যে, আল্লাহ্ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুত আল্লাহ্ই তওবা কবুল-কারী, করুণাময়। (১০৫) আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে। (১০৬) আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহ্র নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে; তিনি হয় তাদের আযাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে, যারা মিশ্র কাজ করেছিল; কিছু ছিল ভাল কাজ (যেমন স্বীকারোক্তি যার উদ্দেশ্য ছিল অনুতাপ। আর এটাই হল তওবা এবং যেমন ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ যা পূর্বে সংঘটিত হয়ে গেছে। যাহোক, এসব তো ছিল ভাল কাজ।) কিন্তু কিছু মন্দ (কাজও করেছে। যেমন, কোন রকম ওযর-আপত্তি ছাড়াই হুকুম অমান্য করা। সুতরাং) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এই আশা (অর্থাৎ তাঁর ওয়াদাও) রয়েছে যে, তাদের (অবস্থার) প্রতি (তিনি রহমতের) দৃষ্টি দেবেন (অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল করে নেবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড় ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। [এ আয়াতের মাধ্যমে যখন তাঁদের তওবা কবুল হয়ে যায় এবং তাঁরা খুঁটির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যান, তখন নিজেদের মালামালসহ মহানবী (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, এগুলো যেন আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা হয়। তখন ইরশাদ হল] আপনি তাঁদের মালামাল থেকে (যা তারা নিয়ে এসেছে) সদ্কা গ্রহণ করে নিন, যা গ্রহণ করার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে (পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে) মুক্ত ও পরিষ্কার করে দেবেন। আর (আপনি যখন এগুলো নেবেন, তখন) তাদের জন্য দোয়া করুন। নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য (তাদের) আত্মার প্রশান্তিস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের স্বীকারোক্তি) যথাযথ শুনেন (এবং তাদের অনুতাপ সম্পর্কে) যথার্থই জানেন। (কাজেই তাদের আত্মার বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আপনাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত এই সৎকর্ম অর্থাৎ তওবা ও অনুতাপ এবং সৎপথে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান আর মন্দ কাজ অর্থাৎ হুকুম লংঘন প্রভৃতিতে ভবিষ্যতের জন্য ভীতি প্রদর্শনের হুকুম বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, প্রথমে উৎসাহ দান করা হয়েছে যে,) তাদের কি এ খবরও নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন, এবং তিনিই সদ্কাসমূহ কবুল করেন? এবং (তাদের কি) এ কথাও জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এই তওবা কবুল করার (গুণের) ক্ষেত্রে এবং রহমত করার (গুণের) ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ? (সে কারণেই তাঁদের কবুল করেছেন এবং স্বীয় রহমতে তাদের মাল গ্রহণ করার এবং তাঁদের জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ভবিষ্যতের ভুল-ত্রুটি ও পাপ কাজ হয়ে গেলে তওবা করে নেবে। আর যদি সামর্থ্য থাকে তবে খয়রাত করবে।) অতপর উৎসাহদানের পর (ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আপনি তাদেরকে একথাও) বলে দিন যে, (তোমরা যা খুশী) আমল করে যাও। বস্তুত (প্রথমে তো) তোমাদের কার্যকলাপ এখনই (অর্থাৎ দুনিয়াতেই) আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রসূল ও ঈমানদারগণ দেখে নিচ্ছেন (ফলে মন্দ কর্মের জন্য দুনিয়াতেই অপমান-অপদস্থতার সম্মুখীন হচ্ছ) এবং অতপর (আখিরাতে) অবশ্যই তোমাদেরকে এমন সত্তার (অর্থাৎ আল্লাহর) নিকট উপস্থিত হতে হবে, যিনি সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে বাতলে দেবেন। (অতএব, تخلف প্রভৃতি মন্দ কর্ম সম্পর্কে

ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাও। এই ছিল প্রথম প্রকার লোকের বিবরণ। পরবর্তীতে দ্বিতীয় প্রকার লোকের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে---) আর কিছু লোক রয়েছে, যাদের বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসা পর্যন্ত মুলতবি রয়েছে যে, (তওবায় তাদের মনের বিশুদ্ধতা না থাকার দরুন) তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে কি (ইখলাস-এর কারণে) তাদের তওবা কবূল করে নেবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা (মনের অশুদ্ধতা ও বিশুদ্ধতার অবস্থা খুব ভাল করেই) অবগত (এবং তিনি) বড়ই হিকমতের অধিকারী। (সুতরাং হিকমতের চাহিদা অনুযায়ী বিশুদ্ধ মনের তওবা কবূল করেন এবং বিশুদ্ধতাহীন তওবা কবূল করেন না। আর যদি কখনও তওবা ছাড়াই ক্ষমা করে দেয়ার মধ্যে হিকমত থাকে, তবে তাও করেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গযওয়ায়ে তাবুকের জন্য যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা প্রচার করা হল এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেয়া হল, তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। গন্তব্যও ছিল দূর-দূরান্তের, আর মুকাবিলা ছিল একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে যা ছিল ইসলামী ইতিহাসের প্রথম ঘটনা। এসব কারণেই এ নির্দেশ সম্পর্কে জনগণের অবস্থায় বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং তাদের দলগুলো কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এক শ্রেণী ছিল নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ লোকদের যারা প্রথম নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় জিহাদের জন্য তৈরী হয়ে যান। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিলেন সেসব লোক যারা প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই সঙ্গী হয়ে যান। আয়াতে—

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ

বলে এসব লোকেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী সেসব লোকের যারা প্রকৃতই মা'যুর বা অক্ষম ছিলেন বলে যুদ্ধে যেতে পারেননি। তাদের উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ অংশে। চতুর্থশ্রেণী সেসব নিষ্ঠাবান মু'মিনের যারা কোন রকম ওযর না থাকা সত্ত্বেও আলস্যের দরুন জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। এঁদের আলোচনা উল্লিখিত وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ অংশে এসেছে। আর পঞ্চম وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ শ্রেণীটি ছিল মুনাফিকদের যারা কুটিলতা ও মুনাফেকীর কারণে জিহাদে শরীক হয়নি। এদের আলোচনা কোরআনের বহু আয়াতে এসেছে। সারকথা, বিগত আয়াতসমূহে বেশির ভাগই পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত মুনাফিকদের আলোচনা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে চতুর্থ

শ্রেণীর লোকদের কথা বলা হচ্ছে যারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও শুধু আলস্যের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল ও কাজকর্ম সংমিশ্রিত—কিছু ভাল, কিছু মন্দ। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবূল করে নেবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এমন দশ ব্যক্তি ছিল যারা কোন রকম যথার্থ ওযর-আপত্তি ছাড়াই গযওয়ায়ে তাবুকে যান্‌নি। তারপর তাদের সাতজন নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তওবা কবূল করে নিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে না খুলবেন, আমরা এভাবেই আবদ্ধ কয়েদী হয়ে থাকব। এঁদের মধ্যে আবূ লুবাবাহ্‌র নামের ব্যাপারে হাদীসের সমস্ত রেওয়ায়েতকারী একমত। অন্যান্য নামের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়েত রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদেরকে এভাবে বাঁধা অবস্থায় দেখলেন এবং জানতে পারলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং তাদেরকে না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন তিনি বললেন, আমিও আল্লাহ্‌র কসম খাচ্ছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এদেরকে খুলব না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আমাকে এদের খোলার নির্দেশ দান করেন। এদের অপরাধ বড়ই মারাত্মক। এরই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াতটি নাযিল হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) এঁদের খুলে দেবার নির্দেশ দান করেন। অতপর তাঁদের খুলে দেয়া হয়।—(কুরতুবী)

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ লুবাবাহ্‌কে বাঁধনমুক্ত করার যখন সংকল্প প্রকাশ করা হয়, তখন তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেন, যতক্ষণ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) রাযী হয়ে নিজের হাতে না খুলবেন, আমি বাঁধাই থাকব। সুতরাং ভোরে যখন তিনি নামায পড়তে আসেন, তখন পবিত্র হস্তে তাঁকে খুলে দেন।

সদাসৎ মিশ্রিত আমল কি? ঃ আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের কিছু আমল ছিল নেক, কিছু ছিল মন্দ। তাদের নেক আমল তো ছিল তাদের ঈমান, নামায, রোযার অনুবর্তিতা এবং উক্ত জিহাদের পর্ববর্তী গযওয়াসমূহে মহানবী (সা)-র সাথে অংশগ্রহণ, স্বয়ং এই তাবুকের ঘটনায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেয়া এবং এ কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা প্রভৃতি। আর মন্দ আমল হল গযওয়ায়ে তাবুকে অংশগ্রহণ না করা এবং নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা মুনাফিকের সামঞ্জস্য বিধান করা।

যেসব মুসলমানের আমল মিশ্রিত হবে কিয়ামত পর্যন্ত তারাও এ হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত ঃ তফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ জামাআত তথা দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক। যে সমস্ত মুসলমানের আমল ভাল ও মন্দে মিশ্রিত হবে, তারা যদি নিজেদের

পাপের জন্য তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্যও মাগফিরাত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করা যায়।

আবূ ওসমান (র) বলেছেন, কোরআন করীমের এ আয়াতটি উম্মতের জন্য বড়ই আশাব্যঞ্জক। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী শরীফে মি'রাজ সম্পর্কিত এক বিস্তারিত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যখন মহানবী (সা)-এর সাক্ষাত হয়, তখন তিনি তাঁর কাছে এমন কিছু লোককে দেখতে পান যাদের চেহারা ছিল সাদা। আর কিছু লোক যাদের চেহারা ছিল কিছু দাগ-ধাববাযুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর এ লোকগুলো একটি নহরে প্রবেশ করল এবং তাতে গোসল করে বেরিয়ে এল। আর তাতে করে তাদের চেহারার দাগগুলোও সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে সাদা হয়ে গেল। হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁকে জানালেন যে, স্বচ্ছ চেহারার এ লোকগুলো হলো যারা ঈমান এনেছে এবং পাপতাপ থেকেও মুক্ত থেকেছে-اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগুলো হলো যারা ভালমন্দ সব রকম কাজই মিশিয়ে করেছে এবং পরে তওবা করে নিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করে নিয়েছেন এবং তাদের পাপ মোচন হয়ে গেছে।—(কুরতুবী)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আয়াতের ঘটনা হল এই যে, উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যারা কোন রকম ওযর-আপত্তি ছাড়াই তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে আবদ্ধ করে নেন। অতপর উল্লিখিত আয়াতে তাদের তওবা কবূল হওয়ার বিষয় নাযিল হয় এবং বন্ধনমুক্তির পর তাঁরা শুকরিয়াস্বরূপ নিজেদের সমস্ত ধন সম্পদ সদ্‌কা করে দেয়ার জন্য পেশ করেন। তাতে রসূলে করীম (সা) এই বলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান যে, এসব মালামাল গ্রহণের নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় যে, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ (অর্থাৎ এদের মাল থেকে গ্রহণ করুন।) ফলে তিনি সমগ্র মালামালের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ মালের সদ্‌কা গ্রহণ করতে সম্মত হন। কারণ, আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেন সমগ্র মাল নেয়া না হয়; বরং তার অংশবিশেষ যেন নেয়া হয়। مِنْ অব্যয়টিই এর প্রমাণ।

মুসলমানদের সদকা-যাকাত আদায় করে তা যথাযথ খাতে ব্যয় করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ঃ এ আয়াতের শানে-নুযুল অনুযায়ী যদিও বিশেষ একটি শ্রেণী বা দলের সদ্‌কা বা দান গ্রহণ করার নির্দেশ হয়েছে, কিন্তু তা নিজ মর্ম অনুযায়ী ব্যাপক।

তফসীরে কুরতুবী, আহ্‌কামুল কোরআন জাস্‌সাস, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে একেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কুরতুবী ও জাস্‌সাস, একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন

যে, এ আয়াতের শানে-নুযুল অনুযায়ী যদি সেই বিশেষ ঘটনাকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও কোরআনী মূলনীতির ভিত্তিতে এ হুকুমটি ব্যাপক ও সাধারণই থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য বলবৎ থাকবে। কারণ, কোরআনের অধিকাংশ বিশেষ বিশেষ হুকুম-আহ্‌কাম বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু তার কার্যকারিতা পরিধি কারো মতেই সেই বিশেষ ঘটনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যে পর্যন্ত নির্দিষ্টতার কোন দলীল না থাকবে, এই হুকুম সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক বলেই গণ্য হবে এবং সবাইকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এমনকি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে যদিও নির্দিষ্টভাবে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এ হুকুমটি না তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এবং না তাঁর যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বরং এমন প্রতিটি লোক, যিনি হুযুরে আকরাম (সা)-এর নায়েব হিসেবে মুসলমানদের নেতা হবেন, তিনিই এ হুকুমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবেন। মুসলমানদের যাকাত-সদ্‌কাসমূহ আদায় করা এবং তা যথাযথ খাত অনুযায়ী ব্যয় করার ব্যবস্থা করা তাঁর দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতের প্রাথমিক আমলে যাকাত দানে বিরত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল, তাতে যাকাত দানে বিরত লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিদ্রোহী ও মুরতাদ। আর কিছু লোক এমনও ছিল যারা নিজেদের মুসলমান বলত সত্য, কিন্তু যাকাত না দেয়ার জন্য এমন ছলছুঁতা অবলম্বন করত যে, 'এ আয়াতে মহানবী (সা)-র প্রতি আমাদের কাছ থেকে সদ্‌কা-যাকাত উসূল করার নির্দেশ ছিল, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্তই। বস্তুত আমরা তা মান্যও করেছি। তাঁর ওফাতের পর আবূ বকর (রা)-এর এমন কি অধিকার থাকতে পারে যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে যাকাত দাবি করতে পারেন!' তাছাড়া প্রথম দিকে এ বিষয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে হযরত উমর (রা)-এর মনেও এ কারণেই দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিল যে, যতই হোক, এরা মুসলমান এবং একটি আয়াতের আশ্রয় নিয়ে যাকাত থেকে বিরত থাকতে চাইছে। কাজেই এদের সাথে এমন আচরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে না, যা সাধারণ মুরতাদদের সাথে করা যায়। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) পূর্ণ দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে বললেন, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের ব্যাপারে ব্যতিক্রম করবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবই।

এতে এ ইঙ্গিতই ছিল যে, যারা যাকাতের হুকুমকে শুধুমাত্র মহানবী (সা)-র সাথে নির্দিষ্ট করত এবং তাঁর অবর্তমানে তা রহিত হয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল, তারা অদূর ভবিষ্যতে এমনও বলতে পারে যে, নামাযও মহানবী (সা)-র সাথেই নির্দিষ্ট ছিল। কারণ, কোরআন করীমে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ আয়াতও এসেছে, যাতে নামায কায়েমের জন্য নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে

নামায সংক্রান্ত আয়াতের হুকুম যেভাবে গোটা উম্মতের জন্য ব্যাপক এবং একে মহানবী (সা)-র সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার মত ভ্রান্ত ও অপব্যাখ্যাদানকারীদেরকে কুফরী থেকে বাঁচানো যায় না, তেমনিভাবে خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ আয়াতের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যাদান করাও তাদেরকে কুফরী ও ইসলামদ্রোহিতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এ কথার পর হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ঘুঁচে যায় এবং সমগ্র উম্মতের ঐকমত্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়।

যাকাত সরকারী কর নয়; বরং ইবাদত ঃ কোরআন মজীদের আয়াত خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا এর পর বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যাকাত ও সদ্‌কা রাষ্ট্রীয় কোন কর নয়, যা সরকার পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গ্রহণ করে থাকে; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, গুনাহ্ থেকে ধনী লোকদের পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা।

এখানে উল্লেখ্য, যাকাত-সদ্‌কা উসূলে দু'ধরনের উপকার পাওয়া যায়। প্রথমত, এক উপকার স্বয়ং ধনী লোকদের জন্য। কারণ, এর দ্বারা ধনী লোকরা গুনাহ্ ও অর্থ-সম্পদের মোহজাত স্বভাব রোগের বিষাক্ত জীবাণু থেকে পাকসাফ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা সমাজের সেই দুর্বল শ্রেণীর লালন-পালনের ব্যবস্থা হয়, যারা নিজেদের জীবিকা আহরণে অসমর্থ ও অপারক। যেমন এতীম, বিধবা, বিকলাঙ্গ, ছিন্নমূল, মিসকীন ও গরীব প্রভৃতি।

কিন্তু কোরআনের এ আয়াতে শুধু প্রথমোক্ত উপকারিতার উল্লেখ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেটিই হল যাকাত ও সদ্‌কা উসূলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকারিতাগুলো হল আনুষঙ্গিক। সুতরাং কোথাও এতীম, বিধবা ও গরীব-মিসকীন না থাকলেও ধনী লোকদের পক্ষে যাকাতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে না।

পূর্ববর্তী উম্মতগণের দান-খয়রাতের রীতিনীতি থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। সেকালে দান-খয়রাত ভোগ করা কারো পক্ষেই জায়েয ছিল না। বরং নিয়ম ছিল যে, কোন পৃথক স্থানে সেগুলো রেখে দেয়া হতো এবং আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে যেত। এ ছিল কবূল হওয়ার আলামত। কিন্তু যেখানে আগুন দ্বারা ভস্ম হতো না, সেখানে তা অগ্রাহ্য হওয়ার আলামত মনে করা হতো। অতপর এই অপয়া মালামাল কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করতো না। এ থেকে পরিষ্কার হলো যে, যাকাত ও সদ্‌কার আয়াতের হুকুম মূলত কারো অভাব মোচনের জন্য নয়; বরং তা মালের হক ও ইবাদত। যেমন, নামায-রোযা হলো শারীরিক ইবাদত। তবে উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-র এক বৈশিষ্ট্য এই যে, যে মালামাল আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তার ভোগ-ব্যবহার সে উম্মতের ফকীর-মিসকীনদের জন্য জায়েয করে দেয়া হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক সহী হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে।

একটি প্রশ্ন ঃ এখানে প্রশ্ন উঠে যে, উপরোক্ত ঘটনায় তাঁদের তওবা যখন কবুল হয়েছে বলে আয়াতে বলা হল, তখন বোঝা গেল যে, তওবার ফলেই গুনাহর মার্জনা ও পরিশুদ্ধি হয়ে গেল। এরপরও সদ্‌কা উসূলকে পরিশুদ্ধির মাধ্যম বলা হলো কেন? জবাব এই যে, তওবা দ্বারা যদিও গুনাহ্ মাফ হলো, কিন্তু তার পরেও গুনাহর কিছু কালিমা, মলিনতা থাকা সম্ভব, যা পরবর্তীকালে গুনাহর কারণ হতে পারে। সদ্‌কা আদায়ে সে মলিনতা দূর হয়ে পূর্ণতর বিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে।

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ বাক্যে صَلٰوة অর্থ তাদের জন্য রহমতের দোয়া করা। হুযুরে আকরাম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কারো কারোর জন্য صَلٰوة (সালাত) শব্দ দ্বারা দোয়া করেছিলেন। যেমন, হাদীস শরীফে ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى কিন্তু পরবর্তীকালে صلوة শব্দটি নবীগণের বিশেষ আলামতে পরিণত হয়। সে জন্য অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে অন্য কারো জন্য صلوة শব্দ দ্বারা দোয়া করা যাবে না। বরং শব্দটি নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, যাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়। —(বয়ানুল কোরআন প্রভৃতি)

এ আয়াতে মহানবী (সা)-র প্রতি সদ্‌কা আদায়কারীদের জন্য দোয়া করার আদেশ হয়। এ কারণে কতিপয় ফিকাহবিদ বলেন, ইমাম ও আমীরদের পক্ষে সদ্‌কা দাতাগণের জন্য দোয়া করা ওয়াজিব। আর কেউ কেউ এ নির্দেশকে মুস্তাহাবও মনে করেন।—(কুরতুবী)

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ যে দশজন মু'মিন বিনা ওযরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا আয়াতে। বাকি তিন জনের হুকুম রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। রসূলে করীম (সা) তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং ইখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেওয়া হয়। —(বুখারী, মুসলিম)

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ
أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ
أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ
فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ
أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا
رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

(১০৭) আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। (১০৮) তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (১০৯) যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর সে উত্তম; না সে ব্যক্তি উত্তম, যে স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতপর তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ্ জালিমদের পথ দেখান না। (১১০) তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ—প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর কিছু লোক এমন রয়েছে যারা (ইসলামের) ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে আর (এতে বসে বসে) কুফর (রসূলের শত্রুতা)-এর আলোচনা করবে এবং (এর দ্বারা) মু'মিনদের (জামা'আতের মধ্যে) বিভেদ সৃষ্টি করবে (কেননা,

যখন অন্য একটি মসজিদ নির্মিত হবে এবং বাহ্যত সদিচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন অবশ্যই প্রথম মসজিদের জামা'আতে কিছু না কিছু বিভক্তি আসবে) আর (মসজিদ নির্মাণের এও একটি উদ্দেশ্য যে,) যাতে সেই ব্যক্তির আবাসের ব্যবস্থা হয়, যে (মসজিদ নির্মাণের) পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধী (অর্থাৎ আবূ আমের পাদ্রী), আর (জিজ্ঞেস করলে) শপথ করবে, (যেমন ইতিপূর্বে এক জিজ্ঞাসার উত্তরে শপথ করেছিল) যে কল্যাণ ব্যতীত আর কোন নিয়তই আমাদের নেই। (কল্যাণ অর্থ আরাম ও সুবিধা), আর আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা (এ দাবিতে) সম্পূর্ণ মিথ্যুক। (এ মসজিদ যখন প্রকৃত মসজিদ নয়; বরং ইসলামের ক্ষতিসাধনের মাধ্যম, তখন) আপনি এতে কখনো (নামাযের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াবেন না। তবে যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকে (অর্থাৎ প্রস্তাবের দিন থেকে) তাকওয়া (ও ইখলাস)-র উপর রাখা হয় (অর্থাৎ মসজিদে কোবা) তা (প্রকৃতই) উপযুক্ত যে, আপনি তথায় (নামাযে) খাড়া হবেন। [সুতরাং মহানবী (সা) সময় সময় সেখানে যেতেন ও নামায আদায় করতেন।] এতে (মসজিদে কোবায়) এমন (পুণ্যবান) লোকেরা আছে যারা পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন। (উভয় মসজিদের নির্মাতাগণের অবস্থা যখন জানা গেল। তখন চিন্তা যে), সেই ব্যক্তি কি উত্তম যে নিজের ইমারত (মসজিদ)-এর ভিত্তি রেখেছে আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর, না সে ব্যক্তি (উত্তম) যে নিজের ইমারত (মসজিদ)-এর ভিত্তি রেখেছে কোন ঘাঁটি (গর্ত)-এর কিনারায়, যা পতনোন্মুখ? (অর্থাৎ বাতিল ও কুফরী উদ্দেশ্যে, যাকে অস্থায়িত্বের দিক দিয়ে পতনোন্মুখ গৃহের সাথেই তুলনা করা হয়েছে)। অতপর এটি (এ ইমারতটি) তাকে (নির্মাতাকে) নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয় (অর্থাৎ গর্তের মুখে হওয়ায় সে ইমারত তো পতিত হলোই, সাথে সাথে নির্মাতাও পতিত হলো। কারণ, সেও সে ইমারতে ছিল। আর যেহেতু তাদের কুফরী উদ্দেশ্যাবলী জাহান্নামে পৌঁছার সহায়ক, সেহেতু বলা হলো, ইমারতটি তাকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হলো।) আর আল্লাহ্ এমন জালিমদের (দীনের) জ্ঞান দেন না। (ফলে তারা নির্মাণ তো করলো মসজিদ যা দীনের মহৎ আলামত, কিন্তু উদ্দেশ্য রাখলো মন্দ।) তারা যে গৃহ (মসজিদ) নির্মাণ করলো, তা তাদের অন্তরে (কাঁটার মত) বিঁধতে থাকবে। (কারণ, তাদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে গেল এবং গোপনীয়তা ফাঁস হলো, তদুপরি মসজিদটিকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। মোটকথা, কোন আশাই পূরণ হলো না। তাই) সারা জীবন তাদের অন্তরে হাহুতাশ থাকবে। অবশ্য তাদের (সে আশাভরা) অন্তর যদি লয়প্রাপ্ত হয়, তবে ভিন্ন কথা (সে হাহুতাশও আর থাকবে না)। আর আল্লাহ্ বড় জ্ঞানী, বড় প্রজ্ঞাময় (তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, সে মতে উপযুক্ত সাজা দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুনাফিকদের অবস্থা ও তাদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার কথা উপরের অনেক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে রয়েছে তাদের এক ষড়যন্ত্রের বর্ণনা।